ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২১
বন সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতের দাবি টিআইবির
২১ মার্চ ২০২১

প্রেক্ষাপট: প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বন ও বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষকরে জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, বনকেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা, বায়ুমণ্ডল থেকে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-আক্সাইডের পরিমাণ হ্রাসসহ (কার্বন সিংক/সংরক্ষণ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বনের কার্যকরতা সর্বজনবিদিত। অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ বিবিধ কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ১৩ মিলিয়ন একর বনভূমি উজাড় হচ্ছে, যা ইংল্যান্ডের মোট ভূমির সমপরিমাণ। এছাড়া, বনের জীববৈচিত্র্য ও বনভূমির অবক্ষয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। ফলে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসসহ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বিচারে বন উজাড়ের ফলে বন্যপ্রাণী বিশেষকরে হাতি, গণ্ডার ও বাঘসহ অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির পথে। বনাঞ্চল উজাড়ের ফলে ক্রমশ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিকাজ ও কৃষিজ উৎপাদনসহ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বনভূমি ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ বছর আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'বনের উন্নয়ন: পুনরুদ্ধার ও সমৃদ্ধি পথ'।[১]

বিশ্বের ১৯৫টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'প্যারিস চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিবেশ, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি- ১৫) বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা, বন উজাড়রোধ, বনভূমি পুনরুদ্ধারসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। 'বন আইন-১৯২৭' এর প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের প্রথম 'বন নীতি' ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৪ সালে সংশোধিত জাতীয় বন নীতিতে বন সম্পর্কিত কাজে বনভূমির সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং সর্বশেষ 'জাতীয় বন নীতি ২০১৬'– তে বনভূমির সংরক্ষণ ও বনজ এলাকা সম্প্রসারণ, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষকরে, জাতীয় বন নীতি ২০১৬– তে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট আয়তনের ২০ শতাংশ বনায়ন এবং ৫০ শতাংশ বৃক্ষ আচ্ছাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রক্ষিত বনের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে 'রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়নসহ বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করলেও বনের মধ্য অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যেমে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনের সন্নিকটে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, বনের জমিতে শিল্পায়ন ও নগরায়ন, বনভূমি কৃষি জমিতে রুপান্তরসহ বনের জমি অবৈধভাবে দখলের ফলে বনভূমি ও বনজ সম্পদ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সার্বিকভাবে বন, বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষায় নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমান:

- **বন সংক্রান্ত আইন ও নীতির সীমাবদ্ধতা:** সম্প্রতি খসড়া বন আইন-২০১৯ প্রণয়ন করা হলেও বন বিশেষজ্ঞরা এটিকে ১৯২৭ সালের বন আইনের পুনর্মুদ্রণের নামান্তর বলে অভিহিত করেছেন। বনসংক্রান্ত আইন ও নীতিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা রক্ষায় তাদের মতামত ও দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়া, সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি বিবেচনা না করে স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান, বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতীত প্রস্তাবিত ধারা ২৮ এর মাধ্যমে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংরক্ষিত বনের মর্যাদা রহিতকরণ এবং বনের জমি ব্যবহারের সুযোগ রাখা, সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষায় কার্যকর বিধান না রাখা, বনের জমিতে থাকা অবৈধ দখলদারিত্ব ও স্থাপনা উচ্ছেদে বন অধিদপ্তরের ক্ষমতা না থাকাসহ আইন প্রয়োগে বিবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।
- **আইন ও চুক্তি লঙ্ঘন:** সরকার ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৮০ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও সুপার ক্রিটিকাল প্রযুক্তির নামে সুন্দরবনের সন্নিকটে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে এবং প্রস্তাবিত মোট ৩৩টি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বার্ষিক ১১৫ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর অধীনে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট ও এর চারপাশে ১০ কিলোমিটার এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা বাফার জোন ঘোষণা করা

[১] বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন - http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

হলেও এই এলাকায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ঝুঁকিতে ফেলার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং মহেষখালী দ্বীপের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাতে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে এসব এলাকায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বনভূমির দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিসহ বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। এমন পরিবেশ বিধ্বংসী কার্যক্রমের ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনসহ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় জেলার জনসাধারণের ফুসফুসের ক্যান্সার, অ্যাজমা, হৃদরোগসহ বিবিধ স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।[২] এছাড়া, পরিবেশগতভাবে নাজুক স্থানে বন ও পরিবেশের ক্ষতি করে এমন বিতর্কিত কয়লাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যেমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনার ফলে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে জলবায়ু তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। উল্লেখ্য, বন বিভাগের অনুমতি এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র গহণ করেই এমন পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, যা বন রক্ষায় বন বিভাগের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ব্যত্যয় ও সক্ষমতার ঘাটতির প্রতিফলন।

- **বন উজাড় ও বনভূমি ধ্বংস:** একটি দেশে মোট ভূমির কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বাংলাদেশে এর পরিমাণ ২ দশমিক ৬ মিলিয়ন হেক্টর বা মোট ভূমির ১৭ দশমিক ৫০ শতাংশ। সম্প্রতি প্রকাশিত রেইনফরেস্ট ফাউন্ডেশন নরওয়ের (আরএফএন) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সতেরো বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৬৬ বর্গকিলোমিটার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট ধ্বংস করা হয়েছে, যা আয়তনে প্রায় নারায়ণগঞ্জ শহরের সমান। ২০০২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিবছর দেশে প্রায় চার বর্গকিলোমিটার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইনফরেস্ট ধ্বংস হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০১ সালে বাংলাদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্টের আয়তন ছিল ৯৬৬ বর্গকিলোমিটার যার ২০১৯ সালে কমে দাঁড়ায় ৯০০ বর্গকিলোমিটারে।[৩] বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ এক দশমিক ৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা বিদ্যমান বনাঞ্চলের প্রায় ১০ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট দুই লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি জবরদখল হলেও অধিদপ্তর সর্বশেষ পাঁচ বছরে তিন শতাংশ বনভূমি উদ্ধার করেছে। ভূমি পুনরুদ্ধারে প্রশাসন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তা না পাওয়া, বাধা ও চাপ সৃষ্টি অন্যতম কারণ। এছাড়া, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ২ হাজার হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শালবন, যা ইতিমধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ হারিয়েছে।
- **বনায়ন সম্পর্কিত প্রশমন কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি:** জলবায়ু তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণ না করা, গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা না করা, প্রকল্পের আওতায় আংশিক বনায়ন করে প্রকল্প বাতিল করা, স্থানীয় জনসাধারণকে প্রকল্পের কার্যক্রম ও বরাদ্দসহ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান না করা, বনায়ন সম্পর্কিত তথ্য সরকারের তথ্য বাতায়নে হালনাগাদ না করা, প্রকল্পে কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকা, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে স্থানীয় জনসাধারণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নারী ও অতি-দরিদ্রদের মতামত এবং তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখাসহ বিবিধ সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা বন সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিয়মান।
- **অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বনজ সম্পদ ও প্রাণী পাচার:** ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষম পৃথিবীর বৃহত্তম শ্বাসমূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন নির্বিচারে বৃক্ষনিধন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির সম্মুখীন। অপরিকল্পিত অবকাঠামোসহ উজানের দেশ কর্তৃক নদীতে বাধ নির্মাণের ফলে মিষ্টি পানির প্রবাহে বাধার কারণে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ মারা যাওয়াসহ জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার সুন্দরবন ৪৫৩টি প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল, যা উদ্বেগজনকভাবে বিপদাপন্ন। রয়েলবেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা একসময় ৪০০ থেকে ৪৫০টি থাকলেও বর্তমানে তা ১০০টির কাছে নেমে এসেছে। এছাড়া, বনকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে অবৈধ বনজসম্পদ, যেমন– বাঘ, কুমির, হরিণের মাংস, কাঠ, ইত্যাদি আটক করার পরও পাচারকারীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে গোপনে ছেড়ে দেওয়া কিংবা আইনিব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।
- **বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও অনিয়ম:** জমির দাগ ও খতিয়ানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য সংযোজন করে তা জবরবদখলের সুযোগ প্রদান, ক্ষমতা অপব্যবহার, সংরক্ষিত বনের জমিতে জনসাধারণকে অর্থকরী ফসল আবাদের সুযোগ দিয়ে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়, অবৈধ বনজ সম্পদ পরিবহন, আটক ও জব্দ না করা, স্থানীয় ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট ও সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মী ও বনকর্মীদের যোগসাজশে ভুয়ো দলিল ও নথি তৈরি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্তি, সামাজিক বনের প্লট তৈরিতে প্রাকৃতিক বন স্থায়ীভাবে উজাড় ও তা দখলের সুযোগ সৃষ্টি করা, বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বিধি-বহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেন এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।[৪]

---

[২] সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি এন্ড ক্লিন এয়ার, ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন- https://bit.ly/3cLkGr2

[৩] রেইনফরেস্ট ফাইন্ডেশন নরওয়ে, ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন- https://bit.ly/3r1RnFE

[৪] টিআইবি, ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন- https://bit.ly/3eOHYyH

- **বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ঘাটতি:** বনভূমি, বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচনে বনভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বন বিভাগ বাস্তবায়ন করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ না ঘটায় অর্থের অপচয় বৃদ্ধিসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশবিশেষের বিরুদ্ধে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনীহা, সামাজিক বনায়নের নামে বন ধ্বংস, সংরক্ষিত বনে সামাজিক বনায়ন, রাজস্ব আদায়ের নামে বনজ সম্পদ বিক্রয়, বন উজাড়ের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
- **বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা:** বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শ ব্যতীত বনাঞ্চল বা বনের একাংশকে সংরক্ষিত বন ঘোষণার ফলে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া, জলবায়ু তহবিলের টাকায় বন বিভাগের অনুমতি ছাড়াই গাছ কেটে বনের ভিতরে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রাস্তা তৈরির মত প্রকল্পও অনুমোদনের মত ঘটনার উদাহরণ রয়েছে।
- **পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ণে ঘাটতি:** বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ণে ঘাটতি বিদ্যমান। বন বিভাগের বিরুদ্ধে ভূমি পুনরুদ্ধারের নামে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে হয়রানি ও বন আইনে মামলা দায়ের বা মামলার হুমকি প্রদান, স্থানীয় জনগণকে বনের জমি থেকে অবৈধভাবে উচ্ছেদের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বন বিভাগ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন মোকালোয় গৃহীত প্রকল্পসহ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বন বিভাগের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ণে ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া, জবরদখলকারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারসহ বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচারে ঘাটতির কারণে বনভূমি ও বনজ সম্পদ ক্রমশ উজাড় হচ্ছে।

টিআইবির দাবিসমূহ: আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২১ কে সামনে রেখে বন, বনভূমি ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জাবাদিহিতা এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি নিম্নোক্ত দাবি জানাচ্ছে–

১. প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বনভূমি এবং সুন্দরবনসহ সকল বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে;
২. যথেচ্ছভাবে বনের জমি বরাদ্দ বন্ধ ও বনের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় খসড়া বন আইন-২০১৯ এ গাছশূন্য সরকারি বনের জমিতে বনায়ন ও বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা/ধারা উল্লেখ করতে হবে;
৩. বন আইন সংস্কার করে যুগোপযুগী করতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে সংরক্ষিত বনভূমির জমি বরাদ্দ ও ব্যবহার সম্পুর্ণভাবে বন্ধে খসড়া বন আইন-২০১৯ এ একটি নতুন ধারা সংযুক্ত করতে হবে;
৪. রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে;
৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে ও বনায়ন বৃদ্ধিসহ প্রশমন কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে;
৬. পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ও বনের সন্নিকটে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্প বন্ধ করতে হবে;
৭. বন উজাড় ও বনভূমি ধ্বংস প্রতিরোধে বন থেকে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৮. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বননির্ভর পরিবারের ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করতে হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে বনভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;
৯. প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব বনসৃজন করতে হবে। বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহসহ প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে;
১০. বনজ প্রাণী ও সম্পদ অবৈধভাবে পাচার ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বন ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করতে হবে;
১১. সমন্বিত পরিকল্পনা, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে; এবং
১২. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নজির স্থাপন করতে হবে।

****